কর্মীদের কঠোর নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচন পরিচালনার এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় বিধিবদ্ধভাবে সীমিত রাখার নির্দেশ দেন। নির্বাচনী পদ্ধতির স্বচ্ছতা, পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়, যারা জাতিকে এই অভূতপূর্ব, অতিবৃহদায়তন পরীক্ষার অভিমুখে চালিত করেছিলেন তারা কি এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ও নিঃসংশয় ছিলেন?! ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধীতা সম্পর্কে সচেতন থেকে আম্বেদকর স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যবঞ্চিত এক বিপুল জনসমষ্টিকে জাতির এক সন্ধিক্ষণে স্থির করতে হচ্ছে কোন দল দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ববহনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ! *(The Statesman 1951: December 23)* । দ্বিধাদীর্ণ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুও - নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দৃঢ় আশাবাদ ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেও তিনি চিন্তিত ছিলেন *(Ibid: December 21)* উপযুক্ত, যোগ্য ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন কিনা! ঐ সংশয় যে শুধুমাত্র নেহেরুর দুশ্চিন্তার হেতু ছিল এমন নয়, প্রখ্যাত বাংলা সাময়িক পত্র 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ রচনায় আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদবানী করা হয় যে, নিরক্ষর ও রাজনৈতিকভাবে অসচেতন মানুষজন ভোটাধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় দুই ধরনের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন - স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার বা মহাজন অথবা Radical proletariat; যারা যাবতীয় সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বাস্তবায়নে অসমর্থ হবেন *(শনিবারের চিঠি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ : মাঘ সংখ্যা)*। বহু শিক্ষিত মানুষের অভিমত ছিল তদ্রুপ, যাদের ধারণানুযায়ী স্বাধীনতার প্রারম্ভে 'সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার' নীতির প্রয়োগ রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় বহন করে না *(The Statesman 1951: December 31 and 1952: January 27)* ।

বিধানসভা এবং লোকসভায় মোট ১৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৪৬ জন ছিলেন দলীয় স্পর্শরহিত এবং মতপার্থক্য নির্বিশেষে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সম্পর্কে আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না - পশ্চিমবঙ্গে এমনকি কোন কোন কেন্দ্রে কংগ্রেস ও সোসালিস্ট প্রার্থীরা একত্রে তাদের নির্দল প্রতিপক্ষকে প্রত্যাখ্যান করতে জনসাধারণকে আহ্বান জানাতেও দ্বিধান্বিত হননি *(যুগান্তর ১৯৫১: ডিসেম্বর ২৬)*। অবশ্য নির্দলদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ কংগ্রেসীরা - যে প্রবণতার কথা স্বীকার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু স্বয়ং এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক নেতৃত্ব যাদের চল্লিশ জনকে শেষপর্যন্ত দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কারে বাধ্য হন *(Bandopadhyay 2009: 158)* । আলোচ্য নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ লিখেছেন, 'এ.আই.সি.সি থেকে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করবার জন্য নানারকম পরামর্শ এসেছিল।.... আমরা প্রাদেশিক ইলেকশন কমিটিতে স্থির করেছিলুম যে সাধারণত জেলা কংগ্রেস কমিটির সুপারিশ আমরা গ্রহণ করবো।.... ইলেকশন কমিটির মিটিং সাধারণত সন্ধ্যার পর ডঃ রায়ের বাড়িতে হতো।.... যখন যে জেলার সম্বন্ধে আলোচনা হত সেই জেলার সভাপতি ও সম্পাদক ইলেকশন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতেন' *(ঘোষ ১৯৮২ : ১১২)* কিন্তু অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, বাম ও দক্ষিণ উভয় মতাদর্শবাহী বিরোধীদের ঐক্যের অভাবে। দক্ষিণপন্থী শিবিরে ভারতীয় জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদ বিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের বিপক্ষে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, যদিও তারা সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন যে শুধুমাত্র সম্মিলিত বিরোধীশক্তির পক্ষেই সম্ভব শাসকদলকে

কঠিন প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে বাধ্য করা *(The Statesman 1951: November 4)* । বামপন্থীদের ঐক্যের সম্ভাবনাও ছিল সুদূরপরাহত । ব্যক্তিগত অহংবোধ, আদর্শগত অনমনীয়তা এবং সর্বোপরি আসন সমঝোতা সংক্রান্ত মতবিরোধের কারনে দুইটি বাম-মনোভাবাপন্ন ফ্রন্ট পৃথকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, যথা, United Socialist Organisation of India (USOI) এবং People's United Socialist Front (PUSF)। প্রথমটির অন্তর্গত ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী), আর শরৎচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত Socialist Republication Party। অপরপক্ষে দ্বিতীয়টি গঠিত হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক (সুভাষবাদী), সোসালিস্ট পার্টি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন Revolutionary Communist Party of India (RCPI) এবং Scheduled Caste Federation-কে নিয়ে। সম্পূর্ণ এককভাবে, সঙ্গীহীন অবস্থায় নির্বাচনী লড়াই চালিয়েছিল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি (KMPP) এবং RSP, USOI -এর সাথে আসন সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে *(বসু ১৯৮৬: ১০৭, ১০৮)*।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ণময়, ব্যয়বহুল প্রচারাভিযান স্বভাবতই পরিচালনা করেছিল জাতীয় কংগ্রেস - পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলের অঙ্ক ছিল বিশ লক্ষ টাকা। সর্বোপরি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি তার প্রাদেশিক শাখা সমূহকে সরবরাহ করে লক্ষাধিক রঙিন পোস্টার, নেহেরুর ভাষন সম্বলিত ক্যাসেট এবং দলীয় কৃতিত্ব সংক্রান্ত প্রচারধর্মী একটি তথ্যচিত্র *(Bandopadhyay 2009: 159)* । নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৫৭ তম AICC অধিবেশনে (অক্টোবর ১৮-১৯, ১৯৫১) সভাপতির ভাষনে নেহেরু প্রধান শত্রু হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরাপর দলগুলির ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন *(The Statesman 1951: October 19)*। জন্মলগ্ন থেকে জাতীয় কংগ্রেসের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রসঙ্গটি জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কলকাতায় ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় (জানুয়ারী ১, ১৯৫২) তিনি আরো মন্তব্য করেন, বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস কার্যত সমার্থক *(Amrita Bazar Patrika 1952: January 2)* । স্বভাবতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কৃতিত্বের একক দাবীদার হবার ঐ প্রচেষ্টার বিরোধিতায় মুখর হয় তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা । USOI-এর একটি নির্বাচনী জনসভায় (জানুয়ারী ৫, ১৯৫২) প্রত্যুত্তরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অরুণা আসফ আলী মন্তব্য করেন*(Bandopadhyay 2009: 161)*প্রাক-১৯৪৭ কংগ্রেস একটি যথার্থ জনস্বার্থবাহী জাতীয় সংগঠন হলেও বর্তমানে তা শুধুমাত্র ধনী ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বর কারনে জ্বলন্ত আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে অক্ষম । বামপন্থী বিরোধীদের প্রচারে গুরুত্ব পেয়েছিল খাদ্য ও বস্ত্রের অপ্রতুলতা, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সরকারী ঔদাসীন্য এবং কুচবিহারে পুলিশের গুলিচালনাসহ বিবিধ বিষয় । ২৩.০৪.১৯৫১ তারিখে কুচবিহার শহরে খাদ্যের দাবীতে পাঁচ হাজার মানুষের একটি ভুখা মিছিল বের হয়, যার উপর পুলিশী গুলি চালনায় পাঁচ জন নিহত ও অন্ততপক্ষে চল্লিশ জন আহত হন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটায় এবং পুলিশ সুপারের সরকারী বাসভবন ও জেলা কংগ্রেস সদর দপ্তর আক্রান্ত হলে সেনাবাহিনী তলব করা হয় *(স্বাধীনতা ১৯৫১: মার্চ ২৩)*প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গুলিচালনা 'গর্হিত' বলে মতপ্রকাশ করায় মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের

ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন প্রদেশ কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত প্রস্তাব নেয় যে, সরকারের পক্ষে সর্বদা সচেষ্ট হওয়া উচিত যাতে গুলিচালনার প্রয়োজন না হয় *(ঘোষ ১৯৮২: ১১১, ১১২)*।

সরকারীভাবে নির্বাচনী প্রচারাভিযান সূচনার বহু পূর্বেই এর সূত্রপাত ঘটায় কমিউনিস্ট পার্টি - তার প্রথম নির্বাচনী সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮.০৫.৫১ তারিখে মেদিনীপুর ময়নাতে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর নথি অনুসারে (Serial No.285/26, File No.35/26) স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তৃণমূলস্তরে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছিল CPI- কিন্তু মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষনীয়। সংবাদমাধ্যম একাধারে প্রচারধর্মী ও শিক্ষামূলক উভয়প্রকার ভূমিকা পালনে তৎপর হলেও শাসকদলের প্রতি তাদের সুস্পষ্ট পক্ষপাত এবং সহানুভূতি গোপন থাকেনি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' (বাংলা মাধ্যম); 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' (ইংরেজি মাধ্যম) কার্যত শাসকদলের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। কংগ্রেসী নেতা এবং প্রার্থী তুষারকান্তি ঘোষের মালিকানাধীন অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম দফায় ভোটের দিন (৩.১.১৯৫২) মুদ্রিত হয়েছিল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন সমেত ব্যালটবাক্স ও ভোটপত্র চিত্র! অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল ইউরোপীয় মালিকানাধীন 'The Statesman'। অক্ষর-পরিচিতিহীন ভোটদাতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পথসভা ও প্রতিবাদ বিক্ষোভের পাশাপাশি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয়পক্ষই গণ-সংস্কৃতির নানা মাধ্যমের (সঙ্গীত, নাটক, বাদ্যযন্ত্র) আশ্রয় নেন - সার্বজনীন দুর্গাপূজাগুলির সাথেও বিভিন্ন পর্যায়ের, বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক কর্মীরা জড়িত হয়ে পড়েন। কাফি খানের অঙ্কিত একটি ব্যঙ্গচিত্র দেখা যায় সকল নেতাই দেবী দুর্গার আরাধনায় মগ্ন *(যুগান্তর ১৯৫১: অক্টোবর ৭, ৮)*। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রার্থী ও নির্বাচনী ক্ষেত্র, বিভিন্ন দলীয় প্রতীক, ভোটদানের পদ্ধতি, প্রাত্যহিক নির্বাচনী সভা সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশদে প্রকাশিত হত। অমৃতবাজার পত্রিকার ২৭.১২.১৯৫১ তারিখে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'Please remember bad politians are elected by good citizens who do not vote'.

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের নিজস্ব রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ প্রতিফলিত হলেও কোনো রাজনৈতিক দলই জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রশ্নটি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নির্বাচনী রণকৌশল রচনায় সমর্থ হয়নি। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের ভাষায় 'যতই আমরা প্রগতিশীল হইনা কেন জাতপাতের কাছে আমাদেরও হার মানতে হত।' দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন তিনি এমন উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ভোটারের সম্মুখীন হন, যিনি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন 'আপনি বদ্যি এবং বরিশাল। আমার ভোট আপনি পাবেন' *(সেন ১৯৮৬: ২২৫)*। সাধারণভাবে জাতি-সম্প্রদায়গত বিষয়গুলি উত্থাপিত হত সামাজিক ন্যায়বিচারের আবরনে, জাতি-রাষ্ট্র ও সমতার ধারনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, কারণ তপশিলী সংরক্ষিত আসনগুলিতে ভোটদানের অধিকারী ছিলেন বর্ণহিন্দুরাও। আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন 'Scheduled Caste Federation' ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সাথে বিচ্ছেদের পর মৈত্রী স্থাপন করেছে Socialist-দের সাথে এবং আলোচ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল PUSF-এর অন্যতম শরিক হিসেবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল নগন্য, তাই অধিকাংশ তপশিলী প্রার্থী নির্দল হিসেবে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন - যাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। পাকিস্তানের ভূতপূর্ব আইন ও শ্রমমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ নির্বাচন প্রার্থী হন

বেনিয়াপুকুর-বালিগঞ্জ সংরক্ষিত আসনে *(The Statesman 1951: November 22)* । তার সমর্থনে বিভিন্ন দলিত সংগঠন কর্তৃক অনুষ্ঠিত পথসভাগুলিতে বক্তারা সাধারনভাবে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক-সামাজিক দুরবস্থার বর্ণনাতেই মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক বর্ণমালায় জাতি ও শ্রেণি সংক্রান্ত ধারণা স্থানচ্যুত করেছিল বর্ণকে ।

নতুন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অবলুপ্তি ঘটানোয় পশ্চিমবঙ্গের এক-চতুর্থাংশ ভোটার ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী*(যুগান্তর ১৯৫১: অক্টোবর ২১)*এবং মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সহজবোধ্য কারণেই । সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ কর্মসমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সর্বাধিক সংখ্যক আসনে প্রার্থী মনোনয়নের এবং লীগ প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মুসলমান জনতাকে আহ্বান জানানো হয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট আর সোসলিস্ট ব্যতীত অন্য যেকোন দলভুক্ত প্রার্থীকে সমর্থনের। কিন্তু দেশভাগ - উত্তর পরিস্থিতিতে লীগের ছন্নছাড়া দশার কারণে এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য সংখ্যালঘু ভোটাররা মূলত জাতীয় কংগ্রেসকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেন । আপন ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনার প্রয়োজনে কংগ্রেসরও দরকার ছিল মুসলমান জনসমষ্টির সমর্থনের - পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস মোট একুশজন মুসলমান প্রার্থীকে মনোনীত করে *(Hassan and Roy 2005: 233);* যাদের মধ্যে ১৭ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন । 'মুসলিম স্বার্থ' শুধুমাত্র কংগ্রেসের হাতেই সুরক্ষিত - একথা বারংবার সজোরে ঘোষিত হয়েছিল জওহরলাল এবং প্রাদেশিক নেতৃত্বের দ্বারা । কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্চকিত ঘোষণা সত্ত্বেও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় অনুভূতির সুবিধাজনক প্রয়োগে কংগ্রেস দ্বিধাহীন ছিল । বারাসাতের নিকটবর্তী জিরাটহাটের একটি জনসভায় (আমডাঙা থানার অন্তর্গত) স্বয়ং বিধানচন্দ্রের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জামিয়াত-উল-উলেমার সভাপতি মৌলবী দর্গাপুরী, যিনি পবিত্র কোরান উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেন কেন মুসলমানদের কর্তব্য কেবলমাত্র কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া *(Amrita Bazar Patrika 1951: December 29)* । অন্যত্রও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহৃত হন মুসলিম ধর্মীয় নেতৃত্ব । প্রসঙ্গত মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, 'হাওড়া জেলায় একটি মুসলমান কৃষকপল্লীর ভোট আমাদের পাবার আশা ছিল । হঠাৎ তারা বিগড়ে গেছে । কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি মেয়েদের নিয়ে বসলাম ।.... অবশেষে একজন বলে ফেললো – 'তোমাদের ভোট দেব কি করে? তোমরা ধর্ম মানো না। আল্লার চাঁদ, আমাদের ঈদের চাঁদ, সেখানে তোমরা কুকুর পাঠিয়ে দিয়েছ। এমন পাপ কেউ করে? সোভিয়েতের স্পুটনিক তখন কুকুর লাইকাকে নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমা করছে ... আর তাই নিয়ে এই পল্লীতে আমরা জাতিচ্যুত' *(সেন ১৯৮৬: ২২৫-২৬)*।

পৃথকভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধাংশ মহিলাদের প্রতিও, রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা ছিল গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ । তাই নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মহিলাদের ভোটদানে সহায়তার উদ্দেশ্যে অন্তত একজন নারী ভোটকর্মী রাখার *(Amrita Bazar Patrika 1951: October 31)* । নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে প্রতি রবিবার যুগান্তর পত্রিকার মহিলা পাতায় ভোটদানের ঔচিত্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত । অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মানসিকতাসম্পন্ন, সামাজিক বিচারে পশ্চাৎপদ উত্তর ও মধ্যভারতের ব্যাপক অংশে

মহিলাদের সংগঠিত করা দুরূহ হলেও পশ্চিমবঙ্গে নারী রাজনৈতিক কর্মীদের সক্রিয়তা ও উৎসাহ ছিল তাদের পুরুষ সহকর্মীদের সমতুল্য *(The Statesman 1951: December 30)* । শাসক কংগ্রেস ও বিরোধী দলসমূহ অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নমেরুর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারে সমধর্মী কৌশল অবলম্বন করেন । শাসক দলের নির্বাচনী রণনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য পরিকল্পিত বৈঠকী সভা, যেগুলিতে শুধুমাত্র মহিলা নেতৃত্ববৃন্দই বক্তব্য রাখতেন *(যুগান্তর ১৯৫২: জানুয়ারী ১১ এবং ১৯)* । কংগ্রেসের পক্ষে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা সংগঠিত হন প্রদেশ মহিলা সেবাদলের পতাকাতলে, তাদের নির্বাচনপূর্ব ও পরবর্তী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেন দলের প্রদেশ সভাপতি অতুল্য ঘোষ স্বয়ং *(তদেব: জানুয়ারী ৮)*। কংগ্রেস সাংসদ শ্রীমতি রেণুকা রায় একটি বেতার বক্তৃতায় নারীমুক্তিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশবিশেষরূপে উপস্থাপিত করে, উপযুক্ত বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বঙ্গীয় নারী সমাজকে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান । অন্যান্য দলগুলিও অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করেন, যদিও নারীমুক্তির প্রশ্নটিকে কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলস্রোতের অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচনা করতে তারা দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানান *(যুগান্তর ১৯৫১: ডিসেম্বর ২৪, ২৮ এবং ৩০)* । তবে মহিলাদের নিকট স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অর্থ বা স্বরূপ কিরকম, তা নিয়ে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও সম্ভবত তাদের জনপ্রতিনিধিত্ব তথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে আমজনতা এখনও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বিধানসভার কংগ্রেস মনোনীত ২৩৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র চারজন ছিলেন মহিলা এবং মোট ১৫২১ জন নির্বাচন প্রার্থীর মধ্যেও মহিলারা ছিলেন আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু (মাত্র ১১ জন) *(Amrita Bazar Patrika 1951: November 4 and 1952: January 31)* । এই প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন মন্তব্য করেছেন, 'আমার সঙ্গে পার্টি নেতাদের একটি বিষয় বিরোধ হলো । ১০০টা সীটে আমিই মেয়েদের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিরূপে কেন মনোনীত হব?.. .. কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মহিলা কর্মীদের এতই অযোগ্য মনে করে? অনেক ঝগড়া করে বোঝা গেল - কালীঘাট সীটে অন্য বিরোধী দলগুলির কোন দাবিদার নেই বলেই ওটা কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে এবং ঐ সীটে পার্টিরও কোন দাবিদার নেই বলে আমার ঘাড়েই ওটা পড়েছে'*(সেন ১৯৮৬: ২২২)* । প্রথম বিধানসভায় নির্বাচিত মহিলারা হলেন কংগ্রেসের আভা মাইতি, মীরা দত্তগুপ্ত, রানী অশ্রুমতী দেবী, পুরবী মুখার্জি এবং লেখিকা স্বয়ং ।

নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে একটি প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠীর প্রবল উপস্থিতি যেকোন প্রার্থীর পক্ষেই অগ্রাহ্য করা অসম্ভব ছিল - তারা হলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিন্নমূল জনসমষ্টি, ঐ সময় যাদের সংখ্যা ছিল অন্তত ১৫ লক্ষ *(Chatterji 2007: 112)* । প্রাথমিকভাবে ভারত সরকার জুলাই ২৫, ১৯৪৯-এর পরবর্তী সময় আগত উদ্বাস্তুদের নাগরিক অধিকার দানেও অস্বীকৃত হন । প্রাদেশিক সরকারের আবেদন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সরব প্রতিবাদের ফলশ্রুতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সম্মত হলেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল এদেরকে ভোটদানের অধিকার প্রদানে অসম্মত হন কেননা খসড়া ভোটার তালিকার ব্যাপক পরিবর্তন করতে হলে নির্বাচন আরো বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা । প্রাথমিকভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলন শুধুমাত্র ছিন্নমূল মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দাবীতে সরব হলেও ক্রমশ তা সকল নাগরিক, বিশেষত দরিদ্র, বঞ্চিত জনসাধারনের মৌলিক অধিকারের দাবীতে মুখর হয়ে ওঠে।

কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদের স্বার্থে উল্লিখিত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া উত্থাপিত হলে তাদের সামাজিক ও সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল - নীতিগতভাবেও দাবী করা অসম্ভব ছিল যে শুধুমাত্র উদ্বাস্তুদেরই রাষ্ট্রের নিকটে ঐ অধিকারগুলি প্রাপ্য, অথচ অ-উদ্বাস্তু অন্য সকল দরিদ্র মানুষজনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তাই উদ্বাস্তুরা উৎসাহিত হন সমতার অভিমুখে পরিচালিত বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সংযুক্ত করতে, যার সাথে সাযুজ্য ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের *(Chatterji: 2001)* । এই প্রেক্ষাপটেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং RSP ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ছিন্নমূলদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে - তাছাড়া সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (RCPI), সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক), পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত (সোসালিস্ট পার্টি) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জেলায় জেলায় উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে তাদের যথাযথ পূনর্বাসনের প্রয়োজনে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সংগঠিত করেন। ১৪.০১.১৯৪৯ তারিখে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি বৃহৎ জনসভায় পুলিশের গুলিচালনার ফলে কয়েকজন আন্দোলনকারী গুরুতরভাবে জখম হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (UCRC) আহ্বানে অনুষ্ঠিত জনসভায় (১৩.০৮.১৯৫০) ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু অংশগ্রহণ করেন*(Bandopadhyay 2009: 168)* - মৃণালকান্তি বসু, সাধন গুপ্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার প্রমূখ বিশিষ্ট বামপন্থী নেতারা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন । প্রসঙ্গত কলকাতা এবং অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় ছিন্নমূল জনসংখ্যার ৫০%-এর বেশী কেন্দ্রীভূত ছিলেন এবং ঐ জেলাদ্বয় থেকে CPI দলভুক্ত এগারোজন বিধায়ক নির্বাচিত হন, আরো নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থীরা সামান্য ব্যবধানে পরাস্ত হন। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পশ্চাতে উদ্বাস্তুরা কেবলমাত্র ভোটদাতা হিসেবেই নয়, দলীয় সংগঠক হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত কলকাতা পুলিশের ডি.সি. (স্পেশাল ব্রাঞ্চ)-এর ০২/০১/১৯৫২ তারিখের রিপোর্ট অনুসারে (IB File No.267/47) কলকাতা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির ৩৪ জন সর্বাগ্রগণ্য সংগঠকদের নয় জন ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু ।

ভোটদান প্রক্রিয়ার যাবতীয় জটিলতা সত্ত্বেও প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১.০১% (৭৬৩০৯) বাতিল হিসেবে গণ্য হয় *(Amrita Bazar Patrika 1952: February 14)* । তথাকথিত অশিক্ষিত নির্বাচক মণ্ডলীর বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় আভিভূত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন মন্তব্য করেন, ভারতীয়রা রাজনৈতিক সাবালকত্ব অর্জন করেছেন । যদিও বাস্তবিক পক্ষে ভোটারদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র-ব্যক্তি বিশেষে, স্থান কাল ভেদে, এর তারতম্য ছিল যথেষ্ট । গ্রামীণ ভোটারদের একটি সাধারণ অভিযোগ ছিল ভোট কেন্দ্রের দূরত্ব সম্পর্কে, আপন নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে তাদের ফসল কাটার মরসুমে বেশ কয়েক মাইল দূরত্ব পদব্রজে অতিক্রম করার পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় । শিল্পশ্রমিকেরা অবশ্য কর্মস্থল থেকে সাময়িক বিরতি লাভ করেন এই মূল্যবান অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনে। ব্যাপক মাত্রায় ভিন্নতা লক্ষিত হয়েছিল ভোটদানের হারেও।[১] প্রায় সর্বত্র ভোট দান নির্বিঘ্নে, শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও উত্তেজনার অভাব ছিল না । কলকাতার বৌবাজার কেন্দ্র ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে মুখোমুখি প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র এবং সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি - যার সমর্থনে অন্য সকল প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন, যদিও প্রভূত উত্তাপ সত্ত্বেও ঐ কেন্দ্রে ভোটদানের হার ছিল ৪৪.৯২% *(Bandopadhyay 2009: 172)* । সীমান্তবর্তী কেন্দ্রগুলিতে (প্রধানত নদীয়া, ২৪ পরগনা জেলায়)

কিছু সংখ্যক মুসলিম ভোটদাতা সীমান্ত অতিক্রম করে এসে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিপুল উৎসাহে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেন উপজাতিভুক্ত মানুষজন - বীরভূম জেলায় সাঁওতাল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটকেন্দ্রে আসেন তাদের ঐতিহ্যবাহী পোষাকে, চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্র ও প্রথাগত অস্ত্র সমেত। সাধারণ ও সংরক্ষিত, নগর ও গ্রাম-বিভিন্ন প্রকারের বহু নির্বাচন ক্ষেত্রেই মহিলারা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন অভূতপূর্ব উদ্দীপনায় ও মর্যাদার সাথে। দার্জিলিং জেলায় কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটদানের হার ছিল ৭২% *(The Statesman 1952: January 11)* । 'The Statesman' এবং 'যুগান্তর' সংবাদপত্রে একটি ঘটনা কিঞ্চিৎ হাল্কাভাবে ব্যঙ্গচিত্র সহ পরিবেশিত হয় - জনৈকা মহিলা তার স্বামীর নির্দেশানুযায়ী কোন প্রার্থীকে ভোট দিতে অস্বীকার করে কিঞ্চিৎ কলহের পর ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করেন *(Ibid : January 19)* । আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও উত্তর ভারতের সাথে এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষণীয়, যেখানে প্রায় ২৮ লক্ষ মহিলা নিজেদের নাম বলতে তা স্বীকার করায় ভোট দাতাদের তালিকায় নথিভুক্ত হননি ।

প্রথম সাধারন নির্বাচনের ফলাফলকে (বিধানসভা) একাধিক আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ সম্ভব। জাতীয় কংগ্রেস প্রত্যাশানুযায়ী ২৩৮ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে ১৫০টি আসনে জয়লাভ করে ।[২] যদিও নির্বাচক মণ্ডলীর সংখ্যা (১,২৮,০০,০০০) এবং ভোটদানের হারের (৫৮%) প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণের ২২.৬৪% তার অনুকূলে আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন । কংগ্রেসের নির্বাচনী সাফল্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল উত্তরবঙ্গ, মুসলিম অধ্যুষিত ও সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরে তার প্রাপ্ত ভোট ছিল যথাক্রমে ৬০.৬৯%, ৫৬.৪২% এবং ৫৭.৬৪% *(Ghosh 1981: 22)* । প্রথমোক্ত জেলাদ্বয়ে অপর দলভুক্ত কোন বিধায়ক নির্বাচিত হননি। মালদহ - মুর্শিদাবাদের ২৬টি আসনের ২৩টি তেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হন । তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৫১টি আসনের ৪৩টিতে জয়লাভ করে কংগ্রেস এক্ষেত্রেও চমকপ্রদ সাফল্যের দৃষ্টান্ত রাখে। অবশিষ্ট আসনগুলির বন্টন নিম্নরুপ : CPI - ৩, FB(M) - ২, KMPP - ২ এবং জনসংঘ – ১ *(Bandopadhyay 2009: 176)* । শাসকদল তার জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে রাজধানী কলকাতা (২৬টির মধ্যে ১৭টি) এবং মহানগরী সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলেও (২১টির মধ্যে ১৮টি); প্রসঙ্গত কলকাতা শিল্পাঞ্চলে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক ছিলেন অবাঙ্গালি - উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার থেকে আগত । বহিরাগত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেস অধিকতর প্রভাবশালী ছিল । মূলত KMPP-র উপস্থিতি, নেতৃত্বের ঔদ্ধত্য ও আত্মসন্তুষ্টি এবং দুর্নীতি জনিত মলিন ভাবমূর্তির কারণে মেদিনীপুর, হুগলি এবং চব্বিশ পরগনা জেলায় তার ফলাফল আশানুরুপ হয়নি - যদিও ঐ জেলাত্রয় প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন 'হুগলি গোষ্ঠী'র অন্যতম দৃঢ় ঘাঁটি বলে চিহ্নিত ছিল ।

কংগ্রেসের সাফল্যের পশ্চাতে বিরোধী অনৈক্যের দায়িত্ব অনস্বীকার্য, কেননা মাত্র ৩৩টি কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দাতার সমর্থন লাভ করে। প্রসঙ্গত ১১ জন কংগ্রেস বিধায়ক প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৩০%-এর কম, ৩০জন ৩৫%-এর কম এবং ৬০জন ৪০%-এর কম পেয়েও নির্বাচিত হন *(Mitra 1962: 155-162)* । এই বিষয়ে 'যুগান্তর' (জানুয়ারী ২১, ১৯৫২) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় তীর্যকভাবে মন্তব্য করা হয়,

অধিকাংশ ভোটারের দ্বারা প্রত্যখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও কেউ গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে পারেন। নির্বাচনে বিস্ময়কর ফল করেন নির্দল প্রার্থীরা - তারা একত্রে (৫৯৮ জন) ২০% অধিক ভোট পেয়েছিলেন, যা কংগ্রেস ব্যতীত যেকোন দলের তুলনায় অধিক, অর্থাৎ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভোটদাতা কোন সংগঠিত রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কর্মসূচির সাথে একাত্মবোধ করেননি। বিধানসভার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ আসনে শাসকদল বিজয়ী হলেও ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভার ৭ জন সদস্য (মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩) পরাজয় বরণ করেন। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে হুগলির গোঘাট কেন্দ্রে প্রায় ২১,০০০ ভোটে পরাজিত করেন নির্দল প্রার্থী রাধাকৃষ্ণ পাল, প্রায় ৭০০০ ভোটের ব্যবধানে শ্রমমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী পরাস্ত হন বজবজ কেন্দ্রে CPI প্রার্থী বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা, বরাহনগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসুর কাছে শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী পাঁচ হাজারের বেশী ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করেন। অন্যান্য পরাজিত মন্ত্রীরা হলেন নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বিমল চন্দ্র সিনহা, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, এবং ভূপতি মজুমদার। মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী) প্রার্থী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জীকে বৌবাজার কেন্দ্রে প্রায় ৪০০০ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন *(বসু ১৯৮৬: ১১০)*।

কংগ্রেসের বিজয় অতএব খুব মসৃণ ও দ্বিধাহীন হয়নি । প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক অনিলচন্দ্র ব্যানার্জি কংগ্রেসকে সতর্কবার্তা দিয়ে লেখেন 'It must take into serious consideration certain disquieting factors especially the wide gap between the proportion of seats captured by the congress and the per-centage of votes secured by its candidates' *(Amrita Bazar Patrika 1952: March 22)*অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই মন্তব্য করেন, জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে । স্বাভাবতই উল্লিখিত বিষয়ে বিরোধী দলগুলির কন্ঠ ছিল আরো উচ্চগ্রামে বাঁধা - বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে কংগ্রেস অর্থ, পেশিশক্তি এবং প্রশাসনযন্ত্রের অপব্যবহার করছে নির্লজ্জভাবে *(বসু ১৯৮৬: ১১৪)*। KMPP-র ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ একটি যৌথ বিবৃতিতে আক্ষেপ ভরে স্বীকার করেন যে জনতার রায় স্পষ্টতই বিপক্ষে যাওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলির অনৈক্যই কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন রেখেছে *(The Statesman 1952: February 3)* । প্রসঙ্গত ঐ অনৈক্য ও অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসের কারণে KMPP-কে কঠিন মূল্য দিতে হয় - ৮% ভোট পেলেও জোট গঠনের ব্যর্থতার কারনে তারা জয়লাভ করেন মাত্র ১৫টি আসনে । উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত প্রার্থী ছিলেন হরিপদ চ্যাটার্জী, সুধীর রায়চৌধুরী এবং চারুচন্দ্র ভান্ডারী *(বসু ১৯৮৬: ১১৬)*। অনুরূপ পরিস্থিতিতে PUSF ভুক্ত দলগুলি রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। PUSF মোর্চার একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী অধ্যাপক অতীন বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক সুভাষবাদী) পরবর্তীকালে PSP-তে যোগদান করেন *(দত্ত ২০০২: ২১৯)* ।

দার্জিলিং জেলার তিনটি আসনে জয়লাভ করে গোর্খা লীগ, গোর্খাদের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের দাবির লড়াই করে। তাদের বিজয়ী প্রার্থীরা অবশ্য অনতিবিলম্বে কংগ্রেস পরিষদীয় দলে যোগদান করেন। আশির দশকে হিংসাশ্রয়ী, জঙ্গি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের এটিই ছিল প্রারম্ভিক সূচনা *(Bandopadhyay 2009: 176)*। ভারতীয়

জনসংঘ এবং হিন্দু মহাসভার নির্বাচনী সাফল্যও লক্ষণীয়, তারা একত্রে প্রায় ৮% ভোট ও বিধানসভার ১৩টি আসন দখল করেন। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন, তার দুর্ভাগ্যজনক ও আকস্মিক মৃত্যুর পর জনমানসে জনসংঘের গ্রহণযোগ্যতার অবসান ঘটে *(Franda 1971: 153)* । বিধানসভার প্রতিনিধি প্রেরণে ব্যর্থ হলেও RSP প্রার্থীরা চারটি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন *(Chatterji 2007: 288)* ।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিণতি হল বিধানসভায় বৃহত্তম প্রতিপক্ষ রূপে CPI-এর আত্মপ্রকাশ, বিধানসভা ও লোকসভায় তারা যথাক্রমে ২৮ ও ৫টি আসন দখল করেন । পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রমানিত যে জয়ী আসনগুলির তিন-চতুর্থাংশ তারা পেয়েছেন চব্বিশ পরগণা, হুগলি, কলকাতা ও মেদিনীপুরেই। পক্ষান্তরে উত্তর ও মধ্য বঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে (নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুর) এবং রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে (বীরভূম এবং বাঁকুড়া) কোন কমিউনিস্ট বিধায়ক নির্বাচিত হননি । স্বয়ং বিরোধী দলনেতা শ্রী জ্যোতি বসু স্বীকার করেন যে, দলীয় সাফল্য মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল শহর ও শিল্পঞ্চলে - গ্রামাঞ্চলে সংগঠন ছিল নিতান্তই হীনবল *(বসু ১৯৮৬: ১১৪)*।অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দল মূলত যে সকল অঞ্চলে সফলভাবে গণ আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন, নির্বাচনী সাফল্যও মূলত সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক প্রাসঙ্গিক, আকর্ষণীয় বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, আর্থসামাজিক মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও অধিকতর রাজনৈতিক সচেতন জেলাগুলিতে (বর্ধমান, দার্জিলিং, কলকাতা, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা) কমিউনিস্টদের জনসমর্থন তুলনামূলক বিচারে অধিক। উল্লেখিত জেলাগুলিতে CPI-গড়পরতা ১৪.৩% ভোট পায়। অপরপক্ষে অনুরূপ মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপর ও স্বল্পমাত্রায় রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন জেলাগুলিতে (পুরুলিয়া, কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম, নদীয়া ও বাঁকুড়া) তুলনীয় গড়পরতা জনসমর্থন ছিল ৬.১৩% ।[৩]

প্রবল প্রতিকূলতার *(বসু তদেব :১০৬, ১১৪)*সম্মুখে কমিউনিস্ট পার্টির এই সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই তার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রতিপক্ষরা স্বাগত জানাননি। নির্বাচনের অব্যবাহিত পূর্বে ১৭ জন নির্বাচন প্রার্থী কমিউনিস্ট রাজবন্দী প্যারোলে মুক্তি পেলেও তাদের মধ্যে ১৫ জন (সদ্য নির্বাচিত এক সাংসদ ও তিন বিধায়ক সমেত) নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পুনরায় কারারুদ্ধ হন *(আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৫২ : ফেব্রুয়ারী ১০ এবং বসু তদেব: ১০৮)*। বিদেশি মতাদর্শের দ্বারা 'অনুপ্রাণিত' ও মস্কোর 'প্রভাবাধীন' থাকায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ও প্রকৃত লক্ষ্য (যা তার সন্দেহানুযায়ী ছিল প্রোলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা) সন্দিহান ছিলেন। হিন্দু মহাসভাও অনুরূপ কারণে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা' সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। Amritabazar Patrika -র নিবন্ধকারের ভাষায় 'the leopard would sooner change its spots, than the communists should objure lawlessness and violence' (February 13, 1952). The Statesman-এর সংবাদ দাতার মতে 'of the communist sympathizers here, 99% do not know what communism is and the support they give... is born largely of poverty or frustration' (March 4 1952)। আন্তর্জাতিক মহলও কম আতঙ্কিত হয়নি, Manchester Guardian-এর সম্পাদকীয়তে উদ্বেগের সুরে মন্তব্য করা হয় 'com-

munism has taken its foothold in the constitutional politics of three states and it's influence might increase in future because all those who voted for the socialists... might vote for the communist in the next' গণতন্ত্রের স্বঘোষিত অভিভাবক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান ভারতবর্ষের 'গণতন্ত্র রক্ষার্থে' ৭৯ কোটি ডলার সাহায্যের আশ্বাস দেন, যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং ভবিষ্যতে কমিউনিস্টদের জনসমর্থন হ্রাস পায় *(The Statesman 1952: March 9)* । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাফল্যে তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে গণতন্ত্রেরই তথাকথিত সমর্থকদের উদ্বেগ উন্মোচিত করে তাদের দ্বিধাগ্রস্ত স্বরূপকেই ।

REFERENCE

1. Bagchi, A.K. (1998). Studies on the Economy of West Bengal since Independence, *EPW, XXXIII (47-48)*.
2. Bandyopadhyay, S. (2009). *Decolonization in South Asia : Meanings of freedom in post independent West Bengal 1947-1952*, NewYork: Routledge.
3. বসু, জ্যোতি. (১৯৮৬). *জনগণের সঙ্গে - প্রথম পর্ব,* কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ।
4. Chatterji, J. (2007). *The Spoils of Partition, Bengal & India 1947-1967*. New Delhi: Cambridge University Press.
5. Chatterji, J. (2001). Right or Charity? The Debate over Relief and Rehabilitation in West Bengal 1947-50. In Suvir Kaul (Ed.)*, The Partitions of Memory, The Afterlife of the Divisions of India.* New Delhi: Permanent Black.
6. দত্ত, সত্যব্রত. (২০০২). *বাংলা বিধানসভার একশো বছর, রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র.* কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ।
7. Franda, M.F. (1971). *Political Developments and Political Decay in Bengal*. Calcutta : Firma KLM.
8. Ghosh, A. (1981). *Peaceful Transition to Power; A Study of Marxist Political Strategies in West Bengal 1967-1972*. Calcutta : Firma KLM.
9. ঘোষ, অতুল্য. (১৯৮২). *কষ্টকল্পিত.* কলকাতা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স ।
10. Hassan, M. and Roy, A. (ed) 2005. *Living Together Separately, Cultural India in History and Politics*. New Delhi : Oxford University Press.
11. Mitra, A. (1962). West Bengal Election, *Economic Weekly, Annual Number*.
12. সেন, মণিকুন্তলা. (১৯৮৬). *সেদিনের কথা.* কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন ।

TABLE : 1

Percentage of Votes polled in a few Assembly Constituencies in the Election of 1952.

No.	Name of the Constituency	% of Votes Polled
1.	Tehatta (Nadia)	25%
2.	Kharagpur (Midnapur)	30%
3.	Berhampore (Murshidabad)	30%
4.	Karimpur (Nadia)	70%
5.	Nalhati (Birbhum)	70%
6.	Bishnupur (24 Parganas)	80%
7.	Raina (Burdwan)	30%
8.	Mainaguri (Jalpaiguri)	40%

Source : S. Bandopadhyay, Ibid, p.171, 173.

TABLE – 2

West Bengal Assembly Election, 1952 : Final Results

Party	Seats Contested	Won	Seats of Votes	Percentage
• INC	236	150	38.49%	
• CPI	79	28	11.13%	
• Socialists	62	00	2.93%	
• KMPP	126	15	8.43%	
• Jan Sangh	85	9	5.69%	
• Hindu Mahasabha	36	4	2.46%	
• Ram Rajya Parishad	11	00	0.05%	

FB (M)	50	10	5.21%
FB (S)	30	01	1.27%
RSP	13	00	0.69%
RCPI	10	00	0.43%
Other Parties*	25	08	1.95%
Independents	201	13	20.26%

* Includes Gorkha League, SRP etc.

Source : Amrita Bazar Patrika, February 12-14, 1952.

TABLE : 3

Percentage of Votes polled by the Congress & CPI in the districts in West Bengal Assembly Poll 1952

Less Articulate Districts	Congress	CPI
Bankura	40.7%	8.7%
Birbhum	30.7%	5.5%
Coochbehar	60.7%	7.9%
Jalpaiguri	56.4%	0.5%
Malda	48.4%	12.5%
Midnapur	31.5%	10.5%
Murshidabad	43.2%	0.75%
Nadia	50.5%	3.00%
West Dinajpur	57.6%	6.00%
Average	46.6%	6.13%

	More Articulate Districts	Congress	CPI
1.	Burdwan	41.6%	8.4%
2.	Calcutta	40.00%	11.6%
3.	Darjeeling	29.2%	22.5%
4.	Hooghly	36.11%	20.3%
5.	Howrah	37.8%	8.6%
6.	24 Parganas	33.1%	14.6%
Average		36.3%	14.3%